আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০০৫

পরিবারই হোক নারী অধিকার নিশ্চিত করার প্রথম সোপান

আজ ৮মার্চ, আর্ন্তজাতিক নারী দিবস। ১৮৫৭ সালে এই দিনে নিউইয়র্ক শহরের বস্ত্রকলের নারী শ্রমিকেরা বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় নির্ধারন ও কর্মক্ষেত্রের মান উন্নয়নের দাবিতে নেমে এসেছিল রাজপথে। সেদিন মালিক শ্রেণীর অমানবিক নির্যাতনও স্তব্ধ করতে পারেনি তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে। বরং নির্যাতিত নারী শ্রমিকদের সেই দু:সাহসী প্রতিবাদই হয়ে উঠেছে নারী আন্দোলনের নিরন্তর প্রেরণার উৎস। পরবর্তীতে নারী নেত্রী ক্লারা জেৎকিনের প্রস্তাব অনুসারে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত নারীদের দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিক কংগ্রেসে ৮ মার্চকে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত সব রাষ্ট্রে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দিনটি আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসাবে পালন করা শুরু হয়। এবছর **"পরিবারই হোক নারী অধিকার নিশ্চিত করার প্রথম সোপান "**-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা পালন করছি আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ ও সম-অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে সিডো, সিডো অপশনাল প্রটোকল, বেইজিং ঘোষণা, পিএফএসহ সকল মানবাধিকার সনদে। বাংলাদেশও এসব ঘোষণার অংশীদার। এছাড়া নারীর প্রতি সমতার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। দূভার্গ্যবশত: সংবিধানের এই গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায্য প্রতিশ্রুতি আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। নারীর প্রতি বৈষম্যর সূত্রপাত হয় তার জীবনের প্রারম্ভেই – নিজ পরিবার থেকেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী ও কন্যাশিশু শিক্ষার অধিকার থেকে, স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। যৌতুক ও বাল্যবিবাহের অভিশাপে জর্জরিত। বাংলাদেশে যত ধরনের নারী নির্যাতন সংঘটিত হয়, তার একটি বড় অংশই সংঘটিত হয় পারিবারিক পর্যায়ে বা পরিবারের সম্পর্কের গন্ডীর মধ্যে। পারিবারিক নির্যাতনকে এদেশে ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয় হিসাবে মনে করার কারণে বেশির ভাগ নির্যাতনেরই প্রতিকার হয় না। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে বিবাহিত নারীদের প্রতি ২ জনের মধ্যে একজন নারী আপনজনের দ্বারা নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হন। শতকরা ১২ ভাগ কর্মজীবি নারী পারিবারিক সহিংসতার কারণে কর্মক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হন। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যমতে, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও বৈষম্যের সার্বিক চিত্র নিম্নরুপ:

- **শিক্ষা :** ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে নারী শিক্ষার হার ৪৮ ভাগ যার বিপরীতে পুরুষ শিক্ষার হার ৬৩ ভাগ। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর জন্য খরচ শতকরা ৩১ ভাগ আর পুরুষের জন্য খরচ শতকরা ৬৯ ভাগ।
- **স্বাস্থ্যসেবা:** নারীরা যথাযথভাবে স্বাস্থ্য সেবা পায় না। ইউনিসেফের তথ্যমতে, বাংলাদেশে শতকরা ৫০ ভাগেরও কম নারী প্রসবপূর্ববর্তী সেবা পান, প্রসবকালীন সময়ে শতকরা ২৫ ভাগেরও কম নারী দক্ষ ধাত্রীর সহায়তা পান এবং শতকরা মাত্র ১৭ ভাগ নারী প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণ করে থাকেন। ফলে প্রসবকালে প্রতি ঘণ্টায় ৩ জন নারী মৃত্যুবরণ করে।
- **পুষ্টি :** দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টিহীনতায় ভোগে এদেশের শতকরা ৫০ ভাগ নারী। গর্ভবতী অবস্থায় একজন মায়ের ওজন বাড়ার কথা ১০ কেজি, কিন্তু বাড়ে মাত্র ৫ কেজি। যার ফলে স্বল্প ওজনের শিশু জন্ম নেয়। চার বছরের নিচের ছেলেদের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি কন্যাশিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে। ফলে এই বয়সের ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মৃত্যুহার শতকরা ২৭ ভাগ বেশি। ইউনিসেফ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পাঁচ বছরের কম বয়সী ছেলেদের থেকে কন্যাশিশুরা শতকরা ১৬ ভাগ কম ক্যালরী পায়।
- **অধিক খাটুনী :** নারীরা সপ্তাহে পুরুষের তুলনায় ২১ ঘন্টা বেশি পরিশ্রম করে। গৃহকর্মের পাশাপাশি অনেক নারী বাইরেও কাজ করে। দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৩৮ ভাগ নারী, যাদের বেশির ভাগই কায়িক শ্রম প্রদান করে বিনা মজুরীতে কিংবা নামমাত্র মজুরীতে। এছাড়াও আইডিএইচআরবি এর তথ্য অনুসারে সমপরিমাণ সময় ও শ্রমের বিনিময়ে একজন নারী শ্রমিক পায় ৬০ টাকা, পুরুষ শ্রমিক পায় ১০০ টাকা।
- **নির্যাতন, ধর্ষণ ও এসিড সন্ত্রাস :** গর্ভকালীণ অবস্থায় এখনো দেশে প্রতি ৩ জনে একজন মা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হন। কেবলমাত্র যৌতুক কিংবা পুত্র সন্তান জন্ম দিতে না পারার জন্য শতকরা ৩০ ভাগ নারী স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতিত হন, যার ফলে স্থায়ী মাতৃ মৃত্যুহার দেখা যায়। শতকরা ৭৫-৮৪ ভাগ নারী শারীরিক ও মানসিক ভাবে তাদের স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হন। খোদ ঢাকা শহরের ৪০% নারীই এধরনের নির্যাতনের শিকার। গত অক্টোবর-ডিসেম্বর (২০০৪) তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে ২৫ জন নারী কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং এসময়ে প্রতিদিন গড়ে ১১ জনের বেশি নারী নিহত হয়েছেন। এই তিনমাসে সবচেয়ে বেশি ঘটেছে ধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত হত্যা, যার সংখ্যা ৩৪২ এর মধ্যে ৩৭ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই তিনমাসে এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন ১১০ জন নারী।

উপর্যুক্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, অধিকাংশ বৈষম্যেরই সৃষ্টি হচ্ছে পরিবার থেকে। পরিবারের মধ্যে যদি নারী অধিকার নিশ্চিত করা ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা না যায়, তাহলে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে সফলতা পেলেও সামগ্রিকভাবে নারীমুক্তির স্বপ্ন রয়ে যাবে সুদূরপরাহত । তাই পরিবারে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা চাই –

- নারীর প্রতি সহিংসতাকে ব্যক্তিগত ও স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে দেখার প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা
- পরিবারে শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তোলার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
- প্রস্তাবিত ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড-এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- পারিবারিক জীবনে নারী ও কন্যাশিশুর উপর সহিংসতা রোধে বিশেষ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- নারী অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ সমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি নারী অধিকার রক্ষার্থে বিদ্যমান আইন সমূহের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং
- নারীর প্রতি সহিংসতারোধে সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়েই মনিটরিং ও ফলোআপের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

আসুন, ৮ মার্চের প্রেরণাকে আমাদের চেতনা ও কর্মে ধারন করি।

তথ্যসূত্র: ইউনিসেফ, উন্নয়ন পদক্ষেপ, দৈনিক প্রথম আলো ও পাক্ষিক অনন্যা

প্রচারে: জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম